Vol. 11 | No. 2 | 1967

Check for updates

৮ সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাউল-তত্ত্বের পূর্বাভাষ

Volume	11
Issue	2
Year	1967
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	হরেন্দ্র চন্দ্র পাল
Published online	December 16, 1967
DOI	10.62328/sp.v11i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v11i2.1
Pages	1-36
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
দশম :
শীত : ১৩৭৪
Check for updates

বাউল-তত্ত্বের পূর্বাভাষ

হরেন্দ্র চন্দ্র পাল

সাহিত্য-জগতে বাউল-গান বাঙলার একটি বিশেষ সম্পদ। বাউল-গানের পূর্ণ বিকাশ বাউল-শ্রেষ্ঠ ফকির লালন শাহ্ (১৭৭৫-১৮৯১)-র গানে দেখিতে পাইলেও, ইহার সূচনা আরও অনেক পূর্বেই হইয়াছে বলিয়া আমরা ধরিয়া নিতে পারি। বস্তুতঃ উর্দু বা হিন্দুস্তানী ভাষা যেমনভাবে পাক-ভারতীয় ভাষাসমূহের সহিত সংস্পৃষ্ট, তেমনিভাবে বাউল গান বাঙলা সাহিত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। ভারত-ভূমিতেই জন্মলাভ করিয়া উভয়ের মূল নানাদিকে প্রসারলাভ করিলেও প্রাকৃতিক আবহাওয়া ইহাদের উভয়েই আকর্ষণ করিয়াছে মুসলিম কৃষ্টি ও সভ্যতা হইতে। মধ্যযুগে মুসলিম-আধিপত্য যেমন পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তেমনি তাহার কৃষ্টি ও ভাবধারাও মানব-সভ্যতাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। সাহিত্য-জগতে উমর-খইয়াম ও হাফিজ সর্বজনপ্রিয়। আর অধ্যাত্ম-জগতে সূফী মনসূর হল্লাজ, মৌলানা রূমী ও মহীউদ্দীন ইব্নুল্-'আরবী সর্বজনশ্রদ্ধেয়। অধিকন্তু কবি হাফিজ ও মৌলানা রূমী বাঙলার সাহিত্য ও অধ্যাত্ম জগতকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। বর্তমান বাঙলা দেশের বিশেষ গৌরব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহাদের উভয়েরই পিতা কবি হাফিজের প্রতি ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধাপরায়ণ। আর রূমীর ভাবধারা অধ্যাত্মতত্ত্ব-বিশ্লেষণে যেমন স্বামী বিবেকানন্দকে সাহায্য করিয়াছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'র পরিস্ফুরণে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে।

বস্তুতঃ রূমীর ভাবধারা বাঙলা-সাহিত্য তথা বাউল-গানকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। মৌলানা জলালুদ্দীন রূমী (১২০৭—১২৭৩) প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন তাঁহার অমর কাব্য 'মস্‌নবী-ই-মন'বী' (বা অধ্যাত্মকাব্য) ও 'কুল্লিয়াতে-শম্‌সে-তব্রীজ' (বা শম্‌সে-তব্রীজের কাব্য-সংগ্রহ) লিখিয়া। বাউল-গানেরও ! ঢ় অর্থ অধ্যাত্মসঙ্গীত। আবার, কবিবর রূমী যেমন তাঁহার কাব্যসমূহকে তাঁহার গুরু বা মুর্শিদ শম্‌সুদ্দীন তব্রীজীর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তেমনি প্রায় সকল বাউল কবিই তাঁহাদের সঙ্গীতে নিজেদের মুর্শিদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। বাউল-শ্রেষ্ঠ লালনও তাঁহার গানে তাঁহার মুর্শিদ সিরাজ সাঁইয়ের নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।

১৬শ শতাব্দীতে রচিত জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল'-কাব্যে রূমীর 'মস্‌নবী' কাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তথায় কতকটা দুষ্ট-ইঙ্গিত থাকিলেও, যাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে, কলিযুগের প্রভাবে ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীর ব্রাহ্মণেরা বিকৃত ধর্মপথ অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা কখনও দাড়ি মুণ্ডন করে না, লাঠি হস্তে ঘুরিয়া বেড়ায়, 'মস্‌নবী'-কাব্য পাঠ করে ও সদাই তাহার আবৃত্তি করে। বস্তুতঃ 'বাউল'-সম্প্রদায়ের প্রকৃষ্ট ছবি আর কি হইতে পারে!

আবার, বাউল-শ্রেষ্ঠ লালন সেই সকল নাদান (বা অবুঝ), যাহারা পার্থিব ভেদাভেদ জ্ঞানের ঊর্ধ্বে উঠিতে না পারিয়া কেবল বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে লিপ্ত তাহাদের প্রতি বক্র-ইঙ্গিত করিয়া, 'মস্‌নবী'-র উল্লেখ অতি শ্রদ্ধার সহিত করিয়াছেন,

মুরশিদের ঠাঁই নে না রে সেই ভেদ বুঝে।
এই দুনিয়ার সিনায় সিনায়
কি ভেদ নবী জানিয়েছে॥
সিনার ভেদ সিনায় সিনায়
সফিনারো ভেদ সফিনায়
যে ভাবে যার মন হলো ভাই
সেই ভাবে সে দাঁড়িয়েছে॥
কু-তর্কী কু-স্বভাবী
তারে ভেদ বলে নাই নবী

ভেদের ঘরে দিও চাবি
শরার কথা বলেছে ॥
লেকেতন[১] বান্দারা যত
বেদ পড়িয়া আওলিয়া হ'তো
নাদানেরা শূল যাচিত
মনছুর তার সাবুদ আছে ॥
তফসীর হোসেনী যার নাম
তাই ধরে মসনবী কালাম
ভেদ ইশারায় লিখা তামাম
লালন বলে নাই নিজে ॥[২]

মানুষের অন্তরে (বা সিনায়) যেখানে ভেদ, সেখানে তাহাদের শাস্ত্রের শাসনে (বা সফিনায়) যে ভেদজ্ঞান থাকিবেই। দেহাতীত বা বাহ্যদৃষ্টির ঊর্ধ্বে উঠিতে না পারিলে বেদ বা কোরানের গূঢ় অর্থ সঠিক নির্ণয় করা যায় না। কোরানের যেমন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আরবীতে 'তফ্‌সীরে-হুসেনী'-তে করা হইয়াছে, তেমনি ফারসীতে 'মস্‌নবী'-কাব্যে করিয়াছেন সুফীশ্রেষ্ঠ জলালুদ্দীন রূমী। মনসুর হল্লাজের কথা পরে বলা হইতেছে।

জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল' সেইরূপ প্রামাণ্য গ্রন্থ না হইলেও, 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বৈষ্ণব-সাহিত্যের একটি বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ ও ইহার গ্রন্থকার একজন বিশেষ পণ্ডিত ও সর্বজনপূজ্য ব্যক্তি ছিলেন। এই গ্রন্থে 'বাউল' শব্দের ব্যবহার যেভাবে করা হইয়াছে, তাহাতে আপাতদৃষ্টিতে 'বাউল' অর্থে বাতুল গ্রহণ করা গেলেও — একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং ইহার ব্যবহারে বেশ একটি শ্রদ্ধার ভাব রহিয়াছে। তাহাতেই মনে হয় সেইকালে 'বাউল'-সম্প্রদায় বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলার ২১ পরিচ্ছেদে সনাতনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য-মাধুর্য বর্ণনায় চৈতন্যদেব বলিতেছেন,

---

১। লোকতন আরবী ল'ক্‌ব্‌তুন্ (বা লকুওতুন্) শব্দের বিকৃত রূপ। ইহার অর্থ বাহ্যদৃষ্টি-দুষ্ট বা বহির্ভূত।

২। লালন-গীতিকা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮), গান নং ২৫৯।

আমি ত বাউল, আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যস্রোতে আমি যাই বহি ॥

এখানে বাউল অর্থ সাধারণ বাতুল বা পাগল নহে, কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। চৈতন্য-দেব নিজেকে এখানে এমন একটি সম্প্রদায়ের সহিত তুলনা করিতেছেন যাঁহারা পার্থিব যে-কোন আকর্ষণের ঊর্ধ্বে।

অন্ত্যলীলার ১৯ পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে,

আচার্য গোঁসাঞী প্রভুকে সন্দেশ কহিল ॥
তরজা[১] প্রহেলি আচার্য কহে ঠারে ঠোরে।
প্রভু মাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে ॥
প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥
বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিও কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি সব প্রভুকে কহিলা ॥

এখানে চৈতন্যদেবের মাতার সম্মুখে আচার্য গোঁসাই জগদানন্দের মাধ্যমে চৈতন্য-দেবের নিকট সংবাদ পাঠাইতেছেন—তাই এমনভাবে বলা হইতেছে যাহাতে শ্রীচৈতন্যমাতা কোন দুঃখ না পান। সন্ন্যাসী না বলিয়া বলা হইয়াছে 'বাউল'। 'চাউল'—অর্থে বুঝাইতেছে বাউল-মর্মবাণী। এই সকল গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ কথা সাধারণ লোকের নিকট বলিয়া কোন লাভ নাই, তাই বলা হইয়াছে 'হাটে না বিকায় চাউল'। 'আউল' অর্থ শ্রেয় বা শ্রেষ্ঠ; সুবিধাজনক অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

আবার, যেখানে শ্রীচৈতন্যদেবকে 'মহাবাউল' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে তিনি সাধনার অতি উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত। দশেন্দ্রিয়াদি তাঁহার বশীভূত। তিনি পরমাত্ম-মিলনে একান্তভাবে উন্মুখ। কৃষ্ণধন-প্রাপ্তিরূপ সকল দেহাত্ম বা দ্বৈতভাব

১। তর্জা (বা তর্জী-'বন্দ্') সাঙ্কেতিক বন্ধনপূর্বক এক প্রকার ফারসী কবিতা।

পরিত্যাগ পূর্বক তিনি একাত্মরূপে 'মহামিলন' লাভ করিতেছেন। তাই তাঁহাকে 'মহা বাউল' বলা সার্থক হইয়াছে।

দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহাবাউল নাম ধরি,
শিষ্য লঞা করিল গমন।
মোর দেহ স্বসদন, বিষয় ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি গেল বৃন্দাবন ॥
(অন্ত্যলীলা, ১৪ পরিচ্ছেদ)

অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁহার 'বাংলার বাউল ও বাউল গানে' লিখিয়াছেন যে 'বাউল' শব্দটির প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'; আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' 'বাউল' শব্দের উল্লেখ বহুল দৃষ্ট হয়। ডক্টর ভট্টাচার্য 'বাউল' শব্দকে 'বাতুল' শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিলেও, এই 'বাতুল' শব্দের ব্যবহার বাউল-গানের কোথাও পাওয়া যায় না। তাছাড়া, বাউল-সম্প্রদায় কখনও নিজেদের বাতুল বা পাগল বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন, এমন মনে হয় না। আর বাউল-গানের রসগ্রাহী কোন ব্যক্তি তাঁহাদের ছন্নছাড়া বাতুল বা পাগল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন, ইহা কখনই হইতে পারে না।

'বাউল' বস্তুতঃ ব্‌লী (বা ওয়লী) শব্দের সহিত সংস্পৃষ্ট। 'মহাবাউল' বা শ্রেষ্ঠ বাউল বলিতে বুঝি আউবল্ ব্‌লী (আউল্ ওয়লী) বা উয়ালীয়ে-আউল্। এই 'আউল্ ওয়লী'-ই বোধহয় 'আউল-বাউল' রূপে বাঙলা-সাহিত্যে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। আবার, 'ব্‌লী'-র বহুবচন 'আউলিয়া'। বলী অর্থে বুঝায় সেবক, বন্ধু বা সাধক। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় শ্রেষ্ঠ সেবক, বন্ধু বা সাধক আর কে আছেন! আর আউলিয়া সুফী-ধর্মের একটি সম্প্রদায় বিশেষ। এই আউলিয়া-সম্প্রদায়ের বিশেষ উল্লেখ বাউল-গানে রহিয়াছে। লালন বলিতেছেন,

ও মন, শেখ ফরিদ আউলিয়া ছিল
সত্তর সাল জঙ্গলে ছিল
কত কষ্ট উঠাইল জানো না।[১]

১। হারামণি, ৫ম খণ্ড (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১), নং ১৭১।

আবার,

নেজাম নামে বাটপাড় সে ত
পাপেতে ডুবিয়ে রইত,
তার মনে সুমতি দিলে,
আউলে খাতায় নাম লিখালে।[১]

এই নিজামুদ্দীন আউলিয়া ভারতের একজন প্রসিদ্ধ সুফী সাধক। তাঁহার কবরগাহ দর্শনার্থে দিল্লীতে এখনও অনেক লোক সমবেত হয়।

'মৌলা' শব্দটিও বাউল-গানে বিশেষ দৃষ্ট হয়। এই মৌলার উল্লেখ করিয়া লালন বলিতেছেন,

ভক্তি না হইলে ও মওলা দীদার কি মেলে,
মানুষরূপে দীন দয়াময় ও তারে চেন খেয়ালে।[২]

এখানে মৌলা খোদা বা ভগবানের সমার্থক হইয়া গিয়াছে। এই মৌলা (প্রভু), মৌলবী বা মেব্‌লবী- (Mevlevi order of) দরবেশদের প্রবর্তক ছিলেন জলালুদ্দীন রূমী। রূমীর পরবর্তী-যুগে তুরস্কে এই নৃত্যপরিবেশণকারী দরবেশ (বা Whirling Darvishes)-দের বিশেষ সমাদর ছিল। কীর্তনের সঙ্গে নৃত্যের যে সমাবেশ শ্রীচৈতন্যযুগে প্রবর্তিত হয়,—তাহাও কি সেই Whirling Darvish-দেরই প্রভাব-পুষ্ট বলিয়া আমরা অনুমান করিয়া নিতে পারি? তবে এইটুকু সত্য যে শ্রীচৈতন্য যেমন 'মহাবাউল' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, তেমনি সুফীধর্মাবলম্বী অনেক ব্‌লী বা সাধকের সান্নিধ্যেই তিনি আসিয়াছিলেন। এই পরস্পরের আদান-প্রদানেই গড়িয়া উঠিয়াছে একদিকে যেমন বৈষ্ণব গীতি-কবিতা, অন্যদিকে তেমনি ইসলামী মরমিয়া বাঙলা কাব্য বা বাউল-গান।

জয়ানন্দ তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গলে' আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে রূমীর মসনবী-কাব্যের নিয়মিত পাঠক ছিল জগাই ও মাধাই। ইহাতে যদিও সেই একই দুষ্ট-ইঙ্গিত ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু আমরা সহজেই অনুধাবন করিতে পারি যে মসনবীর ন্যায় আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ ফারসী কাব্যের যাঁহারা পাঠক, তাঁহারা কখনই সাধারণ ব্যক্তি হইতে পারেন না। এবং প্রেমের গূঢ়-তত্ত্বের আস্বাদ

১। বাংলার বাউল ও বাউল গান, নং ৬।

২। হারামণি, ৫ম, নং ১৮৯।

পাইয়াছিলেন বলিয়াই জগাই-মাধাই শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মে অতি সহজেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আর এই জগাই-মাধাই য়ের উল্লেখও বাউল-গানে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। লালন বলিতেছেন,

জগাই-মাধাই দুটি ভাই
কান্দা ফেলে মারলে গায়,
তারে তো নিলে।
আমি পাপী ডাকছি সদায়,
দয়া হবে কোন কালে।[১]

আবার,

জগাই-মাধাই দস্যু ছিল,
তারে গুরুর কৃপা হ'ল,
অধীন লালন দোহাই দিল
সেই আশাতে।[২]

সাধারণভাবে ভারত-ভিত্তিক উর্দু যেমন বৈদিক তথা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হিন্দীর সমগোত্রীয়, তেমনি বাউল-গানের ভিত্তি ভারত তথা বৈদিক উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণ বা বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্র-শাস্ত্রীয় নানা মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহাদের উভয়ই আরবী-ফারসী শব্দ-ভাণ্ডার বা মুসলিম-কৃষ্টির গৌরবোজ্জ্বল সুফীমতবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যেমন উর্দু ভাষার চর্চা করিয়াছেন, তেমনি বাউল-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ই বাউল গানও রচনা করিয়াছেন। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে মুসলিম বাউলগণই বিশেষভাবে বাউলতত্ত্বের গভীরে গিয়াছেন এবং তাঁহাদের তত্ত্বকথায় কোরানের অধ্যাত্মবাদ তথা সুফী মতবাদ বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে যে-কোন ধর্ম তথা অধ্যাত্ম-গ্রন্থের মূল-কথা একই—সেই এক ও অদ্বিতীয় তথা 'লা-শরীক'-এর রূপ বা কার্যধারার প্রকাশ বা বিবরণ,—যদি-বা তাঁহার প্রকাশে বা বিবরণ-ব্যাখ্যায় মতভেদ থাকে। যত বিবাদ

১। বাংলার বাউল ও বাউল গান, নং ৮।
২। ঐ; নং ৭২।

এই প্রকাশনের রূপান্তরে বা তাঁহার বহিরঙ্গের বিশ্লেষণে। এই বহিরঙ্গ বলিতে বুঝি ধর্মের নানা অনুষ্ঠান বা কাব্যের অলঙ্কার নিরূপণ। কী সুন্দরভাবে সেই মহান অদ্বিতীয় (পুরুষ) বা 'না-শরীকে-'অলা' (لا شريك له)-র বর্ণনা করিয়াছেন বাউল-শ্রেষ্ঠ লালন ফকির।

কোন সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে।
দেখ সে আপনি বাজায় আপনি মজে সেই রবে ॥
নামটি না-শরিকালা.
সবার শরিক সেই একেলা,
আপনি তরঙ্গ আপনি ভেলা,
আপনি খাবি খায় ডুবে ॥[১]

এই গানেরই একাত্ম সুর পাই রূমীর মস্‌নবী-কাব্যের প্রস্তাবনাতেই ঃ

শুনরে, কী যে ব্যথা বাঁশী বলে,
বিরহের ব্যথাই যে সে বলে।
ঘর হ'তে মোরে ছিনে এনেছে যবে,
মোর সুরে কাঁদে স্ত্রী-পুরুষ সবে।
দগ্ধ হিয়া চাইরে বিচ্ছেদ তরে,
প্রেম-ব্যথা যে তবে কইতে পাইরে।
রয়েছে যে তার বঁধু থেকে সরে।
সে-ই যে খুঁজে বঁধু-মিলন তরে।

এই যে বিরহ-ব্যথা বর্ণনা করার আকুতি ও সঙ্গে সঙ্গে বঁধু-মিলন বা সাঁই (বা স্বামি) লাভের আগ্রহ তথা স্বামি (আমিই যে 'স্ব') অর্থাৎ সোহহং বা 'অনাল্‌-হক্ক্‌' উপলব্ধির প্রচেষ্টা,—তাহারই প্রকাশ রহিয়াছে বাউল-গানে।

এই 'অনাল-হক্ক'-তত্ত্বের সর্বপ্রথম প্রবর্তক হইলেন সুফী-সাধক মনসুর অল্‌-হল্লাজ। তিনি তাঁহার 'কিতাবুল-তবসিন্‌' নামক আরবী গ্রন্থে বলিয়াছেন, "যখন পরমাত্মা বা ভগবৎ-সত্তার সহিত জীবাত্মা বা ভক্ত-প্রেমিকের মনন-ধারা একীভূত হইয়া যায় তখনই সেই সাধক (বা বলী) বলিয়া উঠে, 'অনাল্‌-হক্ক্‌'।"

১। ঐ ; নং ৩০

৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য দেশের শীরাজ নগরে তাঁহার জন্ম হইলেও তাঁহার অধিকাংশ জীবন তিনি ইরাক ও বাগদাদেই অতিবাহিত করেন। কথিত আছে, তিনি ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন এবং তথাকার সিন্ধু, গুজরাট ও পাঞ্জাবের অনেক অধিবাসীকে তাঁহার সুফী-ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সাধক হল্লাজ সুফী কবিদের একান্ত প্রিয়জন এবং তাঁহাদের প্রায় সকলেই তাঁহাকে অতি শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। লালন-শিষ্য দুদ্দুও তাঁহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,

আপনাকে চিনলে পরে চেনা যায় পরওয়াদিগারে।
সাঁই নিরাকারে নিরন্তরে খেলছে খেলা এই আকারে।।
খোদার খোদা
নাই সে জুদা
আরশে খোদা দেলের ঘরে।
আছে দশ জাঙালে সে ঘর ঘেরা
দেখতে পাবি নছীব-জোরে।।
'মান আরফা নাফছাহু ফাকাদ আরফা'-তে আছে প্রচার।
সে যে আপনাকে আপনি বলছেন নবী পরওয়ারে।।
সুগুম সেই মোকামে হাজির থাকো দেল-হুজুরে।
সে যে হ'য়ে ফানা রূপখানা আশকে মাশুক ঘেরে।।
দরবেশ লালন শা কয়,
তরিক এই হয়,—
বন্দেগি হাল্লাজের তরে।
দুদ্দু তরিক ভুলে খাবি খেয়ে
দেশ-দেশান্তর বেড়ায় ঘুরে।।[১]

এখানে হদীস বা হজরৎ মুহম্মদের উক্তির উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে, "যে নিজের স্বরূপ বা আত্মাকে জানিয়াছে, সে-ই (ঠিক) জানিয়াছে।" যে আপনাকে সঠিক জানিয়াছে বা চিনিয়াছে, সে তাহার (পালনকর্তা) পরব্‌র্‌ বা পর্‌ব্‌র্‌দিগার-কেও জানিয়াছে। সেই খুদার আসন বা 'অরশ্‌ অন্তরেই অবস্থিত। সেইজন্যই তো ভগবানকে বলা হয় 'অন্তর্যামী'। সেই অন্তর্নিহিত চিরস্থায়ী মুকাম বা আবাসে যে অন্তর্বাসী হইয়া আছে, সে-ই তাঁহার রূপটি অন্তরে চির-বর্তমান দেখিতে

১। ঐ; নং ১৮৭।

পায়। সেই ফনা (বা আত্মোৎসর্গ)-র রূপটিকে ঘিরিয়াই রহিয়াছে প্রেমিক ('আশিক্) ও প্রেমিকা (ম'শূক্)।[১] পরম-সৌন্দর্যের পূজারী সুফী-সাধকগণ তাই সেই 'এক'-এর বর্ণনায় রূমীর ন্যায় বলিতে পারিয়াছেন,

মাশুক-যে সব, — ও আশেক কায়ারে ;
জীয়তা মাশুক, আর আশেক মৃতরে।
(মসনবী, ১ম খণ্ড, ৩০)

সেই 'অন্তর্যামী' মনোমন্দিরেই রহিয়াছেন, তাঁহাকে বাহিরে খোঁজা ব্যর্থ সাধনামাত্র। তাই দুদ্দু আরো বলিয়াছেন,

খলিলুল্লার[২] কাবা রে ভাই,
সে কাবা পিছেতে হয়,
আদম-কাবাই দেখ না, রে মন, আগে চেয়ে।"[৩]

কিন্তু সেই 'আমি-তত্ত্ব' সাধারণ-লোকের উপলব্ধি করা অতি কঠিন ব্যাপার। তাহা না হইলে কি হল্লাজের ন্যায় এমন মহৎ ব্যক্তি মানুষের শরিয়তি দণ্ডের বিচারে শাস্তি পায়! এই ঘটনার উল্লেখ যেমন অনেক সুফী-কবি করিয়াছেন, তেমনি বাউল-শ্রেষ্ঠ লালনও বলিতেছেন,

আমি কি তাই জানলে সাধন সিদ্ধি হয়।
আমি শব্দের অর্থ ভাবি, আমি সে তো আমি নয়॥
অনন্ত শহর বাজারে
আমি আমি শব্দ করে
আমার খবর নাই আমারে
বেদ পড়ি পাগলের প্রায়॥
যখন না ছিল স্বর্গ মর্ত্য
তখন কেবল আমি সত্য
পারতে হইল বর্ত,
আমি হইতে তুমি কায়॥

১। ম'শূকের প্রকৃত অর্থ যাঁহাকে ভালবাসা যায়। সুফীদের মতে ম'শূক্ হইলেন চির-যৌবনা, The All-Beautiful ভগবান। আমরা এখানে তাঁহাকে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার করিলেও, তিনি বস্তুত: লিঙ্গাতীত।

২। পয়গম্বর ইব্রাহীমকে খলীলুল্লাহ অর্থাৎ ভগবৎ বন্ধু বলিয়া অভিহিত করা হয়। মক্কায় অবস্থিত কাবা মসজিদ ইব্রাহীম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

৩। বাংলার বাউল ও বাউল গান, নং ১৮৮।

মনছুর হাল্লাজে ফকির সে তো
বলেছিল আমি সত্য
সেই প'লো সাঁইর আইন মত
শরায় কি তার মর্ম পায় ।।
'কুম বেইজনি কুম বেয়েজনিল্লা'
সাঁইর হুকুম দুই আমি হীলা
লালন বলে, এ ভেদ খোলা
আছে রে মুরশিদের ঠাঁয় ।।[১]

কথিত আছে, এইরূপে যে তাঁহার মৃত্যু আসিবে, সেই ভবিষ্যদ্বানী হল্লাজ নিজেই করিয়া গিয়াছিলেন, "কুম্ ব-ইধ্নী, কুম্ ব-ইধ্ন্-ইল্লাহ" (অর্থাৎ আমার ইচ্ছায়ই তুমি উত্থিত হও, ভগবানের ইচ্ছায়ই তুমি উত্থিত হও)। বস্তুতঃ হল্লাজের ভাষা দ্ব্যর্থ-সূচক : একদিকে যেমন নিজের ফাঁসিকাষ্ঠে উঠার কথা বলিতেছেন, আবার তাঁহার আত্মার উর্দ্ধগতির কথা বলা হইয়াছে,—এইরূপও বুঝাইতে পারে।

এই সাঁই-ই রূপগ্রহণ করিয়াছে 'সহজ মানুষ', 'অধর মানুষ' বা 'মনের মানুষ' আখ্যায় অন্যান্য বাউল-গানে। এই মনের আদর্শ স্ব-রূপটি অতি সহজ হইয়াও ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে। ইহাই আবার সুফীতত্ত্বের 'ইন্সানুল্-কামিল' (বা পূর্ণ মানব) অথবা বাউল-গানের মুর্শিদ বা মানব-গুরু। এই ইন্সানুল্-কামিল হইলেন হিন্দু ধর্মের শ্রীকৃষ্ণ বা মুসলিম ধর্মের হজরৎ মুহম্মদ (বা আহমদ)। বাউলদের নিকট তাঁহাদের মুর্শিদ-ই পূর্ণ মানবের প্রতীক। এই পূর্ণ মানব, সগুণ ব্রহ্ম বা ভগবানের সহিত নির্গুণ ব্রহ্ম বা এক ও অদ্বিতীয় পরমাত্মার তুলনা করিয়া কী সুন্দরভাবে লালন বলিতেছেন,

কোরো না ছেলে দ্বিধা,
যেহি মুরশিদ সেহি খোদা।
বোঝ 'অলিয়ম মরশেদা'
আয়েত লেখা কোরানেতে ।।[২]

১। লালন-গীতিকা, নং ২৫৫।

২। কোরানের 'কহফ্' নামক ১৮শ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোক বা আয়াতে রহিয়াছে, "যাহাকে ভগবান চালনা করেন, সেই বস্তুত চালিত হয়, কিন্তু ভগবৎ-ইচ্ছায় যে বিপথে চালিত হয়, তাহাকে সৎপথে চালিত করিবার জন্য কোন ওয়ালী পাইবে না" (লহু ব্লীয়ান্ মুর্শিদান্)।

আপনি খোদা আপনি নবি,
আপনি সেই আদম ছবি,
অনন্তরূপ ক'রে ধারণ,
কে বোঝে তার নিরাকরণ,
নিরাকার হাকিম নিরঞ্জন,
মুরশিদ রূপে ভজন-পথে ।।[১]

পূর্ণ-মানবের স্বরূপটি আরও গভীরভাবে অনুধ্যান করিয়াছেন ফকির পাঞ্জ শাহ। এবং তাঁহারই জ্যোতিতে যে উদ্ভাসিত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও চরাচর যাহা কিছু আমাদের দৃষ্টিপথে উদিত হইতেছে, তাহা কী সুন্দরভাবে কয়েকটি কথায় কবি পাঞ্জ শাহ ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন।

নবি চিনে কর ধ্যান।
আহাম্মদে আহাদ মিলে আহাদ মানে ছোববাহান ।।
'আতিউল্লাহ্ আতয়ার রছুল' দলিলে আছে প্রমাণ,
আল্লার নুরে নবীর জন্ম, নবীর নুরে সারে জাহান্,
নুরে জানে আদমতনে বসত করে বর্তমান ।।
আউয়ল, আখের, জাহের, বাতন—চারিরূপে বিরাজমান।
বাতনে গোপনে থেকে জাহেরে দেন তরিক-দান ।।
তরিক ধর, সাধন কর, আখেরে পাবা আসান।
বর্তমানে নাহি জেনে পাঞ্জ হল হতজ্ঞান ।।[২]

ফনা (বা আত্মোৎসর্গ) সার্থক হইলেই লাভ হয় সুফীদের 'বকা' বা চিরস্থায়িত্ব। এই আত্মোপলব্ধি হইলেই (চির-) বর্তমানের স্বরূপটি জানিতে পারা যায়—যাহা এখনও সঠিক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কবিবর হতজ্ঞান হইয়াছেন। এই চির-বর্তমানের স্বরূপটি হইল 'ছোব্বাহান' (বা স্বব্বাঃহান্) অর্থাৎ বৈদিক 'ঊষা' বা ঈরানীয় 'নৌরুজ' অবস্থার প্রতীক। আহমদ অর্থাৎ পূতঃ জীবাত্মা বা পূর্ণ-মানব হজরৎ মুহম্মদ যখন আহদ বা একক পরমাত্মার সহিত মিলিত হন, তখনই উদ্ভাসিত হয় চির-বর্তমান 'ছোব্বাহান'। এই সত্যটির প্রমাণরূপে কবিবর উল্লেখ করিয়াছেন হদীসের উক্তি 'আতা আল্লাহ আতা-অর্-রসূল্' অর্থাৎ

১। বাংলার বাউল ও বাউল গান, নং ৬৭

২। ঐ, নং ২৩২

ভগবান (যে জ্যোতি বা নূর পয়গম্বরকে) দান করিলেন (তাহাই সারা বিশ্বে) পয়গম্বর দান করিলেন। প্রাণ-জ্যোতি-রূপে সেই নূরই সর্ব জীবে অবস্থান করিতেছে। সেই জ্যোতিই যেমন বিরাজিত (সৃষ্টির) আদিতে (আউয়ল), তেমনি রহিয়াছে সৃষ্টির শেষে (আখির); যেমন প্রকাশিত (জাহের) বাহ্য-জগতে, তেমনি তাহা গুপ্ত (বা বাতিন) অন্তর্লোকে। এই অবস্থাটিরই বর্ণনা আমার একটি প্রবন্ধের উপসংহারে নিম্নলিখিত রূপে ব্যক্ত হইয়াছে :

> This faith in the Omniptoent One (or the Self Itself) is the salvation of the soul which may be gained through the light of Religion (or by deepest Contemplation or total absorption of pure soul). And this "real presence" (or the "timeless present") —the Sufistic *hal* turned to *baqa*, i.e. the Great *Nauruz*)—in the spatio-temporal process—of that which transcends space and time is the essence of religion, in its highest no less than its lowest forms. This *Nauruz* is really the "eternal now" of Eckhart who says of his mystic union with the higher Self or God thus: 'It ranks so high that it communes with God face to face as he is. (It)...is unconscious of yesterday or the day before and of to-morrow and the day after, for in eternity there is no yesterday nor any to-morrow, but only Now. ('Umarkhayyam on the Cohcept of the Beautiful, *Dr. Md. Shahidullah Felicitation Volume, 1966*).

পূর্ণ-মানব ও একক ভগবানের পার্থক্যটি 'আহদ' ও 'আহমদ' শব্দের ব্যবহার দ্বারা কী সুন্দরভাবে বাউল-শ্রেষ্ঠ লালন তাঁহার নিম্নলিখিত গানে ব্যক্ত করিয়াছেন :

আকার বা নিরাকার সাঁই রব্বানা,
আহাদ আর আহমদের বিচার হৈলে যায় জানা।
হায়রে আহামদ নামে দেখি
মিম হরফ লেখে নবী
মিম গেলে আহাদ বাকি
আহামদ নাম থাকে না।[১]

আমাদের প্রভু (বা রব্বানা) সেই পরম স্বামী সাকার কি নিরাকার, তাহা 'আহদ্' (বা এক) -তত্ত্ব না জানিলে কখনই সঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না।

১। হারামণি, ৫ম খণ্ড, নং ১।

পরম ব্রহ্ম গুণাতীত— তাঁহাকে 'আহদ' বা এক (ও অদ্বিতীয়) বলিলেই সীমিত করা হয়। আ-হদ্ শব্দটির মধ্যেই এই অর্থ নিহিত রহিয়াছে। মৌলানা রুমী সেই পরম তত্ত্বটি একটি কথায় অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,

কী মোরা এই খণ্ড-বিখণ্ড ধরায় ?
যদি সে আলিফ্, কি রয় ?—কিছু না রয়।

তাই রুমীর কথায়ই আবার বলিতে হয়,—

এই প্রশস্তি মোর তরে গুণ-প্রশমন ;
করে প্রমাণ অস্তি এই, মোর পাপ-মন।
অস্তি মুখে তাঁর, শোভে নাস্তি মোদের ;
সম্মুখে তাঁর, অস্তি কী ?—নভ বিধুর।
(মস্‌নবী, ১ম খণ্ড, ১৫১৪, ৫১৭-৮)

নিজ-অস্তিত্বের বিলোপ করিতে পারিলেই তাঁহার সীমিত একক (আ-হদ) অস্তিত্বের প্রকাশ হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আলিফের প্রতীক সেই পরম স্ব-রূপটি অসীম ও অনন্ত—কোন বর্ণনা দ্বারাই সেই অ-ধরকে ধরিবার উপায় নাই। তবে যাহারা রূপের কাঙ্গাল, তাহাদেরও নিরাশ হইবার দরকার নাই। 'মিম্' তথা আহ্‌দের অন্তর্বর্তী—আহমদের ভজনা করিলেই সেই পরম-রূপের উপলব্ধি করিতে পারিবে।

এই 'মিম্'-এরই প্রতীক হইল 'মীন্' (ফারসী মাহ)-রূপী মানব-গুরু বা মুর্শিদ, যিনি প্রেম-সমুদ্রে সদাই বিরাজ করিতেছেন। এই অন্তর্নিহিত অর্থটি কী গভীর সঙ্কেতের সহিত ফকীর পাঞ্জ শাহ তাঁহার নিম্নলিখিত বাউল-গানটিতে ব্যক্ত করিয়াছেন,

মূল সাধন কর মালেক চিনে।
মীনরূপে সাঁই গভীর জলে,
যোগ-সাধন করো বর্জোক ধ্যানে ॥
মীন আল্লা নিজ নাম ধরে,
কালামোল্লায়[১] দেখ জেনে,

১। কালামোল্লা বা কলামে-আল্লাহ অর্থে বুঝাইতেছে কোরান, যেখানে আল্লাহ-র বাণী সঙ্কলন করা হইয়াছে।

আছে নির্মল মহল মণিপুরে,
খেলেছে খেলা ঘাটি ত্রিপিনে ॥[১]
সে দরিয়ার মাঝে তরী,
হাওয়া বারি আতশপুরী,
কৃপানন্দ আদরিণী—
বসে তথা মধুপানে ॥
মীনের খবর জীব কি জানে,
মীন ধরে অনেক সন্ধানে,
হীরুচাঁদ কয়, ভাব না জেনে
পাঞ্জ ম'লি শেউলি টেনে ॥[২]

নিরাকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম গুণাতীত হইয়াও ভক্ত-প্রেমিকের উপলব্ধির জন্য মীন-রূপে প্রেম-সমুদ্রে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে মুর্শিদ-রূপী 'বর্জখ্'-এর ধ্যান দ্বারা জানিতে হইবে। পঞ্চভূতে সৃষ্ট দেহ-ধারী মানব সেই দিল-দরিয়ায় তরীর ন্যায় ভাসমান। এই দেহ-তরীর সাহায্যেই তাহাকে ভব-সিন্ধু তরিতে হইবে। কল্পতরু জগদ্ধাত্রী জগত্তারিণী প্রকৃতি মা সদা তথা আনন্দে বসবাস করিতেছেন। "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।" সাধারণ মানুষ সেই গভীর রহস্য কি বুঝিবে! 'পাঞ্জ' (বা পঞ্চ রিপু) দ্বারা ক্লিষ্ট সাধারণ জন বাহ্যিক শুদ্ধাচারে লিপ্ত থাকিয়া কেবল নদীর শেওলা পরিষ্কার করিয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানে লিপ্ত না থাকিয়া আমাদের 'ভাব'-টিকে উদ্দীপ্ত করিতে হইবে। কোরানে উল্লিখিত এই 'বর্জখ' শব্দটি খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। ইহা একদিকে যেমন দ্বৈত-ভাবের সৃষ্টি করিয়া বাধা বা প্রাচীর-রূপে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান, আবার মুর্শিদ-রূপে দ্বৈত-ভাব দূর করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত একত্রী-করণে সাহায্য করিতেছে।

যেমন আত্মতত্ত্ব তেমনি সৃষ্টি-তত্ত্বেও দেখিতে পাই যে বাউল-কবিগণ বিশেষ-ভাবে কোরান, হদীস বা সুফী-দার্শনিকদের চিন্তাধারার সাহায্যেই তাঁহাদের তত্ত্বকথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তবু ভাবিয়া অবাক হইতে হয় যে কী সহজ, সরলভাবে

১। অর্থাৎ, ত্রি-বেণীর ঘাটে — যেখানে ত্রি-ধারা মন আত্মার সহিত মিলিত হয়।

২। বাংলার বাউল ও বাউল গান, নং ২৬৮।

সেই গভীর তত্ত্বপূর্ণ ভাবধারা আমাদের নিকট তাঁহারা উপস্থাপিত করিয়াছেন। আত্মোপলব্ধি লাভ করিয়া লালন বলিতেছেন,

আমি ডুব দিয়া রূপ দেখিলাম প্রেম-নদীতে।
আল্লা, আদম ও মোহাম্মদ তিনজনা এক নূরেতে নূরেতে—
সে সাগর অকূলেরও—আদি অন্ত নাই তারও—
নিঃশব্দ ছিল সিন্ধু আদিতে আদিতে।
আচানক দিয়া নাড়া, সেই শব্দ করলেন খাড়া,
—সেই সৃষ্টির গোড়া আদিতে আদিতে।
শব্দ হইল 'কুন্' জানো কার বিবরণ,
নিঃশব্দ ছিল সিন্ধু আদিতে,
আহাদ্-ইয়াত জাত নূর, এলেমে হয় জহুর
'ফাহা' অজুত কোণেতে কোণেতে।
দীনহীন লালন বলে, সেই নূরের কথা বলে যাই সভাতে
—শুনবেন যত মহতে মহতে।[১]

আর কোরানে (২ ; ১১৭) আছেঃ "তিনি যখন কোন বিষয় সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কেবল বলেন, 'কুন্' (হও) এবং ইহা (তৎক্ষণাৎ) হইয়া যায় (ফ-ইয়কূনু)।" সিন্ধুরূপ পরমাত্মা হইতেই শব্দ-ব্রহ্মের উৎপত্তি। 'আহদিয়ৎ' (বা একত্ব) হইতে জাত সেই জ্যোতি 'আলিম্ (বা জ্ঞানী)-র নিকট জহূর্ (বা প্রকাশিত) হয় এবং তাহা হইতেই (বা ফ-হা) এই জ্যোতি ব্জূদ্ (অজুত) বা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই তত্ত্বকথা কেবল মহৎ-ব্যক্তিই অনুধাবন করিতে পারেন।

বস্তুতঃ সেই পরম-স্বরূপ যেমন অনন্ত ও অসীম, তেমনি তাঁহার শক্তিও অসীম এবং তাঁহার রূপ সর্ব্বব্যাপী। কোরানের আয়াৎ (বা শ্লোক) উল্লেখ করিয়া তাহাই আর একটি বাউল-গানে ব্যক্ত হইয়াছে,

কুল্লে সাইন মোহিত'[২] আরও,
'আল্লাকুল্লে সাইন কাদিরো'[৩]

১। হারামণি, ৫ম খণ্ড, নং ২০৪।
২। 'অলা কুল্লি শঈন্ মুহিতুন্ অর্থাৎ তিনি সর্ব্বব্যাপী অথবা সবকিছুতেই বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছেন।
৩। 'অল্লা কুল্লি শঈন্ ক্বাদিরুন্ অর্থাৎ তিনি সব কিছু বা সকলের উপর ক্ষমতা বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন।

পড়ে কালাম নেহাজ করো,
তবে সব জানিতে পারো,
কেন লালন ফাঁকে ফেরো,
ফকিরি নাম পাড়াও মিথ্যে ।[১]

উল্লিখিত কোরান বাক্য (বা কলাম্) স্মরণ রাখিয়া আমাদের প্রার্থনায় মনোনিবেশ করিতে হইবে—তাহা না হইলে সেই প্রার্থনার কোন মূল্য নাই। যথার্থ যে ফকীর সে সদা ভগবৎ-চিন্তা (বা ফক্কর্)-তেই লিপ্ত থাকিবে, না হইলে 'ফকীর' নাম গ্রহণের কোন সার্থকতা থাকে না। এই সম্পর্কে যেমন হদীস্-বাণী রহিয়াছে, "ভগবৎ-চিন্তাই (অল্-ফক্কর্) আমার অহঙ্কার বা গৌরবের বিষয় (ফখ্‌রী)", তেমনি লালন ফকীরও গাহিয়াছেন,

যে জানে ফানার ফিকির সেই ফকির।
ফকির হয় কি কল্লে নাম জিকির ।[২]

সেই 'আলিফ্' বা পরম-স্বরূপের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত তিনটি রূপ — মানব-আদিপুরুষ আ-দম, মানব-শ্রেষ্ঠ আ-হমদ বা মুহম্মদ ও সর্ব-মানব পূজ্য আ-হদ (একঃ) বা আল্লাহ। 'দম' বিশিষ্ট আদমকে কোরাণে চেতনশক্তির আদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। লালন বলিতেছেন,

আদম ছবি যখন চেতনে আইল,
এই ফেরেস্তাকে খোদা হুকুম করিল,
--'তোমরা সকলেই সেজদাতে মেলো
আবার আমি আসলাম খোদে অন্য কেহ নাই।'
সকল ফেরেস্তা সেজ্‌দা করিল,
আজাজিলের মনে অহঙ্কার জন্মিল,
আবার শয়তান বলে তার কলঙ্কী হ'লো
—লানতের তক গলে দিলেন তাই।
আদমকে ছেজ্‌দা করতে বলছেন সাঁই।

১। বাংলার বাউল ও বাউল গান, নং ৬৭।

২। লালন-গীতিকা, নং ২৩৭।

আবার দয়া করে খোদা মকরুমরে কইল,
—'এই আদম ছেজ্‌দা করলে আমারই হইল'।[১]

কোরানে ব্যক্ত হইয়াছে যে সৃষ্টির আদিতে রহিয়াছেন আদম এবং এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইল তাঁহার মাধ্যমে পরম সত্তাকে জানা। যখন অন্যান্য ফিরিস্তহ পৃথিবীতে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিতে সাহস করিলেন না, ভগবান আদমকে সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিলেন ও সকল বিষয়ের শুদ্ধ (স্বর্ফ্‌) তত্ত্ব (আয়ৎ)-টি তাঁহাকে শিখাইলেন। আবার অন্যস্থানে বলা হইয়াছে, সকল বিষয়ের নাম অর্থাৎ ইহাদের অন্তঃস্থিত সত্তা (অস্‌মা কুল্লহা) তাঁহাকে শিখাইলেন। তারপর সকল ফিরিস্তহকে তাঁহাকে প্রণাম বা সিজ্‌দহ করিবার জন্য ভগবান আদেশ করিলেন। সকল ফিরিস্তহই সেই আদেশ মানিয়া লইলেন, 'অজাজীল্‌ তাহা মানিল না। কারণ, সে ছিল একান্তভাবে উদ্ধত, অহঙ্কারী ও পরম সত্তায় অবিশ্বাসী। ভগবান তাহাকে তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে উত্তর করিল, 'আমি তাহার চেয়ে মহত্তর, কারণ আপনি আমাকে অগ্নি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাকে মাটি হইতে।' সৃষ্টিকর্তার প্রতি সৃষ্টজীবের এই উত্তর পরম ধৃষ্টতার পরিচয়। এবং ইহা মিথ্যা প্রতারণারও পরিচয় এই কারণে যে, মাটি হইতে সৃষ্ট হইলেও আদম যে তাঁহার নিকট হইতে প্রকৃত শিক্ষালাভ দ্বারা তাহার মাটির দেহের শুদ্ধিসাধন করিয়াছে তাহা জানিয়া ইব্‌লিস্‌ বা শয়তানে পরিণত আজাজিল তাহা অস্বীকার করিল। এইরূপে শয়তান ভগবানের অথবা পরমাত্মান্বেষী সকল জীবের 'বাহ্য' শত্রুরূপে গণ্য হইল। এবং অভিশাপ দিয়া বা ল'নতের ত্বৌক্‌ (বা মালা) গলায় পরাইয়া দিয়া ভগবান তাহাকে (স্বর্গ হইতে) বিদায় করিয়া দিলেন।

তারপর পূতঃ জীবনের ভোগদ্বারা তৃপ্তি সাধনের জন্য আদমকে তাঁহার স্ত্রীর সহিত (স্বর্গ-) উদ্যানে বসবাস করিবার জন্য ভগবান আদেশ করিলেন,—কেবল একটি নিষেধ রহিল যে তিনি যেন সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের দিকে কখনই ধাবিত না হন। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় আদম সেই বৃক্ষের দিকে ধাবিত হইয়া ইহার ফল খাইতে বাধ্য হইলেন। এই ফল বস্তুতঃ অপবিত্রতার প্রতীক। এই ফল খাওয়ার

১। হারামণি, ৫ম খণ্ড, নং ১৯৪।

সঙ্গে সঙ্গে আদম ভগবান সান্নিধ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে বা দৃশ্য জগতে প্রেরিত হইলেন। ইহাই সংক্ষেপে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বা মানব জন্মরহস্যের মূল কথা। তাই আদমজাত আদমী বা মানবকে এই ক্লেদপূর্ণ জীবন ত্যাগ করিয়া পুনরায় সেই ভগবান-সান্নিধ্যে বসবাস করিতে হইবে। যতদিন পর্যন্ত তাহা না হয় 'সাঁই'-এর বিরহ-যাতনা ভোগ করিতেই হইবে।

সুতরাং সেই সৃষ্টি-রহস্যের মূলকথা মানব যে বস্তুতঃ আদমেরই স্ব-রূপ, তাহা না বুঝিয়া যে সকল ব্যক্তি আদমের পদ-সেবায় লিপ্ত থাকে তাহাদের 'আজাজিল'-রূপ কবি আখ্যা দিয়া লালন আরো বলিয়াছেন,

আদমের কালেবে খোদা খোদেই বিরাজে।
সেই আজাজিল কবিরা হৈল, আদম পা ভজে—
খাকি আদমের ভেদ।
আজাজিল আর খামতন,
গড়ছে আদম তব গান।
নইলে আদমকে ছেজ্‌দা ফেরেস্তা সাজে!
খাকি আদমের ভেদ—
এ ভেদ পশু কি বোঝে।
'আদম শরীল আমার বাসা'—
বলছেন অধর সাঁই নিজে।
লালন কয় জানলে সেই ভেদ—
সব জানে গো সে।
ঐ ভেদ পশু কি বোঝে—
খাকি আদমের ভেদ।[১]

মানুষের মধ্যেই যে 'অন্তর্যামী' রহিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিতে না পারিয়া যে সকল তথাকথিত কবি মানুষের মধ্যে পার্থক্য দেখে, তাহারা বস্তুতঃ খাম্‌তন্‌ বা বা অপবিত্র দেহধারী। তাহারা পশুতুল্য—শয়তানই হউক বা ফিরিস্তহ হউক। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ফিরিস্তহ-ও আদর্শ মানবের সমতুল্য নহে; আর শয়তান তো পশুরও অধম।

১। ঐ, নং ১৯৫।

'আ' বা আলিফের সহিত 'দম' যুক্ত হইয়া আদম পাইয়াছে গতিশীল প্রাণ। এই চির-গতিশীল প্রাণকে আবার ফিরিয়া পাইতে হইবে চির-স্থিতপ্রাজ্ঞ আদমকে —যে 'জিন্নৎ' (বা উদ্যান)-এর অধিবাসীরূপে ভগবৎ-সান্নিধ্যে সদানন্দে বিরাজ করিতেছেন। তাই বাউল নারায়ণ বলিতেছেন,

বেদম না হলে পরে সহজ মানুষ মেলে না,
যদি বল, বললে কি হয়,
ছান্‌চের জল কি মটকায় যায়,
সে কেবল কথার কথা, বলি শোন ওরে।
দম-মাদারকে ডেকে এনে দমেতে, মন, কর ভর,
দমেব আগে মানুষ জাগে, চলে সে হাওয়ার উপর।
আট কুঠুরি বন্ধ করে উজন তোল তারে।
অধর চাঁদকে ধরবি যদি দম কষে দম সাধন কর।
নারাণে বলে, করব কি,
দম লাগে, দম দেব কি,
এবার তুমি দম মারগে অটলচাঁদের চরণ ধরে।[১]

এই 'দম-মাদার' (বা দম্-মদার্) বস্তুতঃ কুম্ভকের প্রতিভূ। তিনিই 'শূন্যপুরাণ' প্রভৃতি মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে অনেক সময় 'দম্বদার' রূপ পরিগ্রহ করিয়া শিব বা মহাদেবের সমগোত্রীয় হইয়াছেন। তিনিই আবার দমে-মদার বা মাদার শাহ পীর রূপে অনেক লোক-সাহিত্যে উল্লিখিত হইয়াছেন,

যাও জিন্দাপীরের খান্দানে—
আব-হায়াতের মর্ম যে জানে।

এখানে জিন্দাপীর বলিতে বোধ হয় পীর মাদার শাহ-কেই বুঝাইতেছে।[২]

এই যে শ্বাস-নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে আত্মোপলব্ধির প্রচেষ্টা, যাহাকে সাধারণ-ভাবে তন্ত্র-সাধন বা রাজযোগ বলা হয়, তাহাও মূল-কোরান হইতে উদ্ভূত সুফীধর্ম হইতেই বাউলগণ গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তবে তন্ত্র-সাধনার মূল দেখিতে যাওয়া—সে অন্য কথা। তাহা হয়তঃ বৈদিক যুগের পূর্ব হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল।

১। বাংলার বাউল ও বাউল গান, নং ৩৪৫।
২। তুঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'হারামণি ; ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৸৹।

হিন্দুধর্মের রাজযোগ বা হঠযোগ বাউলদের 'তরীক' বা 'তরীকৎ'-এর সহিত তুলনীয়। যেমন হিন্দুদের রাজযোগ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়; অথবা যেমন তান্ত্রিক-মতে হঠযোগ অর্থে বুঝি 'হ' বা চন্দ্রের সহিত 'ঠ' বা সূর্যের যোগ-সাধন, তেমনি 'তরীকৎ'-ই (একমাত্র) পথ যাহাকে অবলম্বন করিয়া ভগবৎ-উপলব্ধির অন্যান্য উর্দ্ধতন মার্গে আরোহন করিতে হয়। বাউলগণ এই ধর্ম-পথ যে ইসলাম-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মুহম্মদ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা জানাইতে গিয়া বাউল-শ্রেষ্ঠ লালন বলিতেছেন,

কে তারে চিনতে পারে।
এসে মদীনায় তরীক যে জানালে এ সংসারে ॥
সবে বলি নবী নবী
নবী কি নিরঞ্জন ভাবি
দেল খুড়িলে জানতে পারি,
আহামদ নাম হ'ল কারে ॥
তার মর্ম সে না যদি কয়
কার সাধ্য কে জানিতে পায়
তাইতে আমার দীন দয়াময়
মানুষরূপে ফেরে ঘোরে ॥[১]

হিন্দুদের যেমন কর্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ (বা প্রেমযোগ), তেমনি সুফীদের শরিয়ৎ, তরীকৎ, ম'রিফৎ ও হকীকৎ। শরিয়ৎ হইল আচার-নিষ্ঠ ধর্ম-কর্ম সাধন। ইহাকে 'আউলিয়া'-গণ ভগবৎ-উপলব্ধির পথে বিশেষ মূল্য দিতে চাহেন নাই। শরিয়ৎ-মার্গের পথিকগণ মিথ্যা স্বর্গ-লাভের আশায় কেবল ধর্ম-কর্ম করেন। যদি তাঁহারা আত্মতত্ত্ব বা প্রেমতত্ত্বের ধারা সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন, তাঁহারা কখনই কেবল আচার-অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাকিতেন না। যাঁহারা লক্ষ্যকে ভুলিয়া উপলক্ষের প্রতি একনিষ্ঠ, তাঁহাদের 'আহম্মক' (আম্মক) বা বোকা আখ্যা দিয়া লালন ফকির বলিতেছেন,

নবীর আইন বুঝা সাধ্য নাই।
যার যেমন বুদ্ধিতে আসে বলে তাই ॥
ভেস্তের লায়েক আম্মক সবে,

১। লালন-গীতিকা, নং ২০৩।

তাই শুনি হাদিস কেতাবে,
আমি এ মত কথার হিসাবে
ভেস্তের গৌরব কিসে জানতে পাই ॥
ঠকলে বলে আম্মক বোকা
সে আম্মক পায় ভেস্তে জায়গা
এ তো বড় পূর্ণ ধোঁকা,
কে ঘোচাবে ধোঁকা কোথা যাই ॥
রোজা নামাজ ভেস্তের ভজন
তাই করে কি আম্মক সে জন,
বিনয় করে বলছে লালন,
থাকতে পারে ভেদ মুরশিদের ঠাঁই ॥[১]

বাউলদের মতে দেহের মধ্যেই যেমন 'অন্তর্যামী' লুক্কায়িত, তেমনি স্বর্গ-নরক তথা সপ্ত-লোক ও সপ্ত-নরক দেহের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, আন্তর-সাধনা তথা দেহ-তত্ত্বের সাধনাদ্বারা সেই তথ্যকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এই দেহ-তত্ত্ব তথা তান্ত্রিক-সাধনাও বাহ্য, ম'রিফৎ বা জ্ঞান-মার্গের পথই বাউলদের মুখ্য। তবে প্রস্তুতির পথে মননশীল মানবকে তাহার প্রাকৃত সত্তা হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে কতকটা দেহ-মনের পরিশুদ্ধির জন্য 'তরীকৎ' সাধনার প্রয়োজন। তাই লালন বলিতেছেন,

যদি শরায় কার্য সিদ্ধি হয়।
তবে মারফতে কেন মরতে যায় ॥
শরীয়ত আর মারফত যেমন
দুগ্ধেতে মিশাল মাখন,
মাখন তুললে দুগ্ধে তখন
ঘোল বলে তাতো জানে সবায় ॥
মুহুরী এ কথা দলিলে কয়
সে মুরশিদ সেই রসুল
তাহাতে নাই কোন ভুল
খোদা সে হয় ॥

১। ঐ, গান নং ২০৯।

মারফত মূল বস্তু বাণী,
শরীয়ত তার সরপোষ জানি ;
ঘুচাইলে সরপোষখানি
বস্তু লয়ে কি সরপোষ ধরে রয় ।।
আক্কেল আওল দরিয়া
দেখ না মন তাতে ডুবিয়া
মুরশিদ ভজন যে লাগিয়া
লালন বলে তাতে ভুল সবায় ।।[১]

খাঁটি জ্ঞান হইলে মুরশিদ-ভজনও মিথ্যা অনুষ্ঠান মাত্র। কিন্তু তাহা না হওয়া পর্যন্ত শ্বাস-নিশ্বাস-প্রক্রিয়া তথা দম বা হাওয়া নিয়ন্ত্রণের সাধনা করার প্রয়োজন রহিয়াছে। তাই লালন আরো বলিয়াছেন,

হাওয়ার ঘরে দম আটকা পড়েছে কি অপরূপ কারখানা।
শুদ্ধ হাওয়া-কালে অনেক দমে চলে
হাওয়া নির্বাণ হলে দম থাকে না ।।
হাওয়া দমে জেকার গণি নিগুম তত্ত্ব শুনি
বলতে ডরাই সে-সব অসম ভাব-বাণী
লীলে নিত্যকারি, হাওয়া যোগেশ্বরী,
হাওয়ার ঘরে দমের হয় নিত্য লেনাদেনা ।।
নির্মল হাওয়া'র গুণ বলবো কি আর
এক সঙ্গে দম হ'লো আর
অঙ্গে হাওয়া দম খেলছে সদায়
ঘরে কলকাঠি যার হাতে বাহিরে সে জনা ।।
যে জন হাওয়া-শক্তি ধরে, যোগে জানতে পারে,
নিগূঢ় করণ কারণ সেই যাবে সেরে,
লালন বলে, মোর কলে বিষম ঘোর
হাওয়ার ফাঁদ পাতিলে যেত সব জানা ।।[২]

এই জ্ঞান-মার্গের সাধনাদ্বারাই ক্রমে খাঁটি সত্যটি অর্থাৎ ভগবান তথা আত্মতত্ত্বের স্বরূপটি জানা যাইবে। শ্রীরূপের সাধনা যে সেই অরূপ তথা পরম

১। ঐ, গান নং ২১৩।
২। ঐ, গান নং ২১৮।

স্ব-রূপেরই ব্যঞ্জনামাত্র তাহা সাধন-পথে ক্রমে পরিস্ফুট হইবে। সেই হকীকৎ বা প্রেম-তত্ত্ব লাভ করিতে হইলে তরিকৎ ও মারিফতের মাধ্যমেই তথায় পৌঁছিতে হইবে। তাই লালন বলিয়াছেন,

সত্য যে কয় শরীয়তে হক্ বলে সেই হকিকতে
তরিকতে কর সাধন।
মারিফতে এবাদৎ করা হইতে হবে জ্যান্তে মরা,
তাই লালন কয়, সে বড় কঠিনের ধন
মারিফত কারে বলে জানে মন;
যদি করতে চাও খোদার ভজন।[১]

এই 'জ্যান্তে মরা' বস্তুতঃ হাদিস-বাণী 'মূতু কব্‌লহ অন্‌-তমূতু'-কে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে। এবং এই হাদিস-বাণীর ব্যাখ্যা সকল সুফী কবিই করিয়া গিয়াছেন। রূমী তাঁহার 'মসনবী'র ষষ্ঠ খণ্ডে 'স্বদ্‌রে-জহানে-বুখারা' গল্পের শেষে উপদেশ-বাণী-রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,

সির্‌রে-মূতু কব্‌লহ মৌতিন্ ঈন্ বুব্‌দ্ ;
কজ্. পসে মুর্দন্ ঘনীমৎহা রসদ।

অর্থাৎ 'জ্যান্তে-মরা'-র রহস্য এই যে মৃত্যুর পরে ধন-সম্পদ লাভ হয়। আবার, কথিত আছে এই গল্প তিনি রচনা করেন, আর একজন প্রসিদ্ধ সুফীকবি 'অত্তারের 'ইলাহী-নামা' নামক কাব্যের একটি কাহিনী অবলম্বনে। তথায় ফারসী কবি কাহিনীর শেষে মন্তব্য করিয়াছেন, (অধ্যাত্মজ্ঞানে) নির্ধন ও অন্ধকে সর্বপ্রথম মরিতে হইবে যাহাতে কবরে তোমার নিকট হইতে কার্পাস বস্ত্র পাইতে পারি।

ববায়িদ্‌ মুর্দ্‌ আওল্‌ মুফ্‌লিস্ ও 'উর্ ;
কি তা কির্বাস্ ইয়াবাম্ অজ্. তু দর্ গূর্।

অর্থাৎ, কামনা-বাসনা ত্যাগ করিয়া এই পার্থিব দেহকে শুদ্ধ করিতে পারিলেই, অধ্যাত্ম-সম্পদ লাভের শক্তি বা সামর্থ্য হয়।

বাউল-তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ পথ হকীকৎ বা ভক্তিমার্গ। তবে হিন্দুশাস্ত্রে যাহাকে ভক্তিমার্গ বলিয়াছে, তাহা বাউলদের গানে প্রেম-মার্গ। অনেকের মতে বৈষ্ণব-কবিতা হইতেই বাউলগণ তাঁহাদের প্রেমতত্ত্বের রূপটি পাইয়াছেন। কিন্তু সুফী-

---

১। হারামণি, ৫ম খণ্ড, নং ১৭৮।

তত্ত্বপূর্ণ ফারসী কবিতার আস্বাদ যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা কখনই এইরূপ বলিতে পারেন না। বৈষ্ণব পদাবলী ও ফারসী গজল উভয়ই প্রেমকাব্য। তবে একটি পার্থক্য বিশেষ লক্ষণীয় এই যে ভক্তির প্রাধান্য এখানে পাঠকদের অনেকটা দ্বৈতবাদী করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সুফী কবিতার প্রেম-লীলা বা 'ইশ্‌ক্‌-বাজী পাঠককে ক্রমশঃ গুরু-শিষ্যের একাত্মবোধকে আরো গভীর করিয়া তুলিয়াছে। 'ইশ্‌ক্‌-বাজীর স্বরূপটি লালন কী সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন!

এশ্‌কোবাজী করগা মন মুরশেদের সাথে,
মূল হারিয়া বসিয়া আছ, খোদা পাবা কিসে?
রছুলুল্লা আর খোদাতায়ালা,
ভিন্ন নয় সে একই আল্লা
নিগুমে করছে খেলা,
খেলছে খেলা জী-তে।
রছুলুল্লা আইন করল জারী,
আপনা কাজে আপনা হেরি,
লালন কয়, মন বিহারী,
এশ্‌কোবাজী জী-তে।[১]

বাউলদের নিকট যাহা ভক্তিতত্ত্ব, তাহাই প্রেমতত্ত্ব, তাহাই আবার গুরুতত্ত্বে রূপান্তর লাভ করিয়াছে। লালনের আর একটি গানে পাই,—

মানুষ গুরু কল্পতরু ভজ মন,
মানুষ হইয়া মানুষ ভজ,
পা'বা মানুষে মানুষ রতন।
গুরুকে নাগর কর, নাগরী হইবে দশ ইন্দ্রিয়
অনুশিষ্য করিতে পারিবে।
গুরুর সেবা প্রসঙ্গ হইলে—
তাতে মিলিবে সিদ্ধি-বস্তু-ধন।
লীলাতত্ত্ব, মিথুনতত্ত্ব যত তত্ত্ব আছে—
বিচারিলে ভক্তিতত্ত্ব মিলিবে তাহারই কাছে।

১। ঐ, নং ১৬৮।

অখণ্ড মানবদেহ, তাই লালন বলে,
জেনে কর তার সাধন।[১]

বস্তুতঃ আত্মাই যে সর্বজীব বা সর্ববস্তুতে প্রকাশ, তাহা জানিলেও 'আত্মা' শব্দটি যেন সেই শক্তি বাঙলা সাহিত্যে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাই বাউলগণ আত্মশক্তি (বা spirit)-র প্রতিশব্দ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন 'রূহ'। ইহা কোরানেরই একটি বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ। এই 'রূহ'-র বিন্যাস করিয়া লালন বলিতেছেন,

মানুষের চরণ ভজন কর মন।
ও একিন জানিও মনে,
ও মুর্শিদ রাজী হলে—
রাজী হবে নিরঞ্জন।
মানুষ রূপে আদম করিল সৃজন,
এই 'রূহ' দিল তাকে করিতে চেতন।
আবার আন্ধার দেখে 'রূহ' ফিরিলেন তখন,
খোদার নিকট দিলেন দরশন॥
আবার 'রূহ'কে সাঁই বলিলেন তখন,
এই 'কালেব' হইতে তুমি ফেরো কি কারণ।
এই 'রূহ বলে 'সাঁই' করি নিবেদন,—
আমি তোমায় না দেখে ফিরি হে কারণ।
মানুষের চরণ ভজন কর মন॥
আবার 'রূহ'কে সাঁই বলিলেন তখন,
আমি হইলাম খোদে—মানুষের পূরণ;
তুমি শীঘ্র হতে হেথায় কর গমন।
তাই ফকির লালন বলে,—
কালেবেই পাইবা আমার দরশন॥[২]

'রূহ' বস্তুতঃ গতিশীল প্রাণের প্রতীক। মানব-মনের গতিশীল প্রাণ-চঞ্চলতার প্রভাব দূর হইলে এই দেহেই 'আত্মা'-র স্বরূপটি প্রকাশিত হইবে।

১। ঐ, নং ৬৮।
২। ঐ, নং ১৬৩।

প্রাণ-চঞ্চল মনই জীবাত্মা, আর স্থিতপ্রাজ্ঞ মনই পরমাত্মা। এই সত্য-রূপটিরই প্রকাশ হইয়াছে নিম্নলিখিত বাউল-গানে।

মন-মানুষ সত্য জান বল যাও কোথায়,—
হাওয়া রূপে এই দেহে আল্লা আসে আল্লা যায়।
ও মানুষ আরও হাকিম হুকুম দেয়,—
আল্লা কেবা দেখতে পায়।
আল্লা বিনে আল্লার দুনিয়ায়
কেবা তাহার কল চালায়।
এই মানুষেই মানুষ আছে,
মানুষ ধরা বিষম দায়।
মন-মানুষ সত্য জান বল যাও কোথায়॥
ও ফকির বলে, হায়রে হায়,
কি করিয়া যাই কোথায়।
এই মানুষই দুর্লভ জনম সব গেল হেলায়।
এই যে মানুষ, ঐ যে মানুষ—
মানুষ ধরা বিষম দায়।
মন-মানুষ সত্য জ্ঞান বল যাও কোথায়॥১

মনের স্বরূপটি বাউলগণ আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন চন্দ্রের প্রতীক দ্বারা। 'চারি চন্দ্র' বা 'চন্দ্রভেদ' বাউল গানের একটি বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ। 'মন'-কে 'চন্দ্রের' প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা যেমন বেদ, পুরাণ বা নানা বৌদ্ধ ও তন্ত্র সাহিত্যে পাই, তেমনি দেখি সুফী সাহিত্যে। চন্দ্রভেদের মূল বাহির করিতে গিয়া বাউলগানের অনেক সমালোচকই গলদ্‌ঘর্ম হইয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় ইহাও বাউলগণ কোরান হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। কোরানের 'কমর্‌' (বা চন্দ্র) নামক ৫৪ম অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে পাই, "(শেষ বিচার) মুহূর্ত নিকটবর্তী হইয়াছে এবং চন্দ্র ভেদ হইল (অন্‌শক্কল্‌-কমরু)।" অধ্যাত্ম অর্থে ইহাতে বুঝায় আত্মোপলব্ধি ঘনায়মান হইলে মনশ্চন্দ্রের নিপাত হয়। ঠিক তেমনিভাবে উপনিষদেও বলা হইয়াছে, কায়, মন ও কাব্য দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া বা জানিবার উপায় নাই। এই চন্দ্রভেদের উল্লেখ করিয়া লালন গাহিয়াছেন,

১। ঐ, নং ১৩।

চারিটি চন্দ্র ভাবের ভুবনে।
ও তার দুটি চন্দ্র প্রকাশ্য হয়
তাই জানে অনেক জনে।।
যে জানে চন্দ্র-ভেদ কথা
বলবো তার কি ক্ষমতা,
ও সে চাঁদ ধরে পায় চাঁদ অন্বেষণ,
যে চাঁদ কেউ না পায় গুণে।।
এক চন্দ্রে চার চন্দ্র মিশে রয়,
ক্ষণেক ক্ষণেক বিভিন্ন রূপ হয়,
ও সে মণির কোঠার খবর জানগে,
সকল খবর সেই জানে।।
ধরতে চায় মূলচন্দ্র কোন্ জন,
গরল চন্দ্র করো অন্বেষণ,
সিরাজ সাঁই কয়, দেখ্‌রে লালন
বিষামৃত মিলনে।।[১]

'বিষামৃত' যে একই সঙ্গে মিলিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সঠিক অনুধাবন করিতে না পারিলে 'মূল চন্দ্র' বা চন্দ্র-তত্ত্বের মর্ম জানা যায় না। নীলকণ্ঠের ন্যায় 'গরল'-কে যে গলাধঃকরণ করিয়াছে, সে-ই তাহার মর্ম বুঝিতে পারে। পরবর্তী গানটিতে এই চারিটি মনশ্চন্দ্রেরই বিশদ বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে,

চেয়ে দেখনারে মন দিব্য নজরে।
চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক মণি-কোঠার ঘরে।।
হ'লে সেই চাঁদের সাধন
অধর চাঁদের পায় দরশন পায়রে।
চাঁদেতে চাঁদের আনন
রেখেছে ফিকিরে।।
চাঁদে চাঁদ ঢাকা দেওয়া
চাঁদে দেয় চাঁদের খেওয়া দেয়রে।
জমিনেতে ফলছে মেওয়া
(ও সে) চাঁদের সুধা ঝরে।।

১। লালন-গীতিকা, গান নং ১৭৯।

নয়ন-চাঁদ প্রসন্ন যার
সকল চাঁদ দৃষ্ট হয় তার হয়রে।
অধীন লালন বলে, বিপদ আমার
গুরু-চাঁদ ভুলে রে॥

এক চন্দ্র বা মনই চারিরূপে প্রকাশিত। প্রেমিক মনকে যেমন কামুক মন ঢাকিয়া রাখিয়াছে, তেমনি আবার তাহাদের লীলা-খেলার মধ্য দিয়া প্রেমের সুধা ঝরিয়া পড়িতেছে। এবং নয়ন-চাঁদ বা মনোদৃষ্টি প্রসন্ন হইলে অর্থাৎ অশুভকে ত্যাগ করিয়া শুভকে গ্রহণ করিলে গুরু-চাঁদ বা আত্ম-দৃষ্টি লাভ হয়। তাই আত্ম-দৃষ্টি লাভের জন্য গুরুকে ভুলিলে কখনই চলিবে না। এই তত্ত্বটিই আরো পরিস্ফুট হইয়াছে ফকির পাঞ্জ শাহ্-র একটি বাউল-গানে,

ও মন শুধু কথায় রতন কি মেলে।
চেতন মানুষের সঙ্গ না মিলে॥
ও মন, আল্লা-নবী আদম ছবি করেছে নীলে
দেখ কে আছে মন কি কলে॥
সিংহাসনে বসে একেলা
ছাদেকী এস্ক পয়দা করলেন মালেক আলা।
ও সেই এস্ক-জোরে নূরে পয়দা করলেন রসুলে.
এসে দোস্তি করলেন দ্বিদলে॥
সেই মহব্বতে আদম গঠিলে,
হাওয়া-আদম-আল্লা নবীর ভেদ কেবা বলে।
ও সেই ভেদ জানিলে অধর মেলে এ ত্রিভুবনে,
জ'না যাবে মুরশিদ ভজিলে॥
মন ভেস্তে যাবার আশা করিলে,
দোজক-ভেস্তের মালেক যেবা, তারে না চে'লে।
অধীন পাঞ্জ বলে, ভেদ না জেনে কালমা পড়িলে,
শেষে পড়বি রে গোলমালে॥[১]

এখানে 'দ্বিদল' বলিতে বুঝাইতেছে নর-নারী প্রেমের দুইটি কমলদল। এই নর-নারী-সুলভ সাধারণী বা প্রাকৃত প্রেমই ক্রমে সমঞ্জসা বা মানবীয় প্রেমে রূপান্তর লাভ

১। বাংলার বাউল ও বাউল গান, নং ২৫৫।

করে। আবার, প্রেমের গভীরতার মধ্য দিয়া ইহা সমর্থা বা ঐশ্বরিক প্রেমের যোগ্য হয়। এই ঐশ্বরিক (বা স্বাদিকী) প্রেম (বা 'ইশ্‌ক্‌')-এর কথা যেমন বলা হইয়াছে উপরে উদ্ধৃত বাউল-গানে, তেমনি আবার অন্যরূপে নিম্নলিখিত গানে পাইতেছি,

(ও সে) অধর মানুষ নদীর কূলে ঘাট বেঁধেছে।
তাহাতে মণিমুক্তা ভিয়ান ক'রে ঘাটে শান বেঁধে দিয়েছে ।।
পদ্মা যমুনা মিলে ভাগীরথীর লোনা জোয়ারে।
এসে তিনভাবে তিন নদীর জল ভাটা-জোয়ার খেলতেছে ।।
আদ্য মানুষ অধরচাঁদে একরূপ তিনরূপ ধরেছে ।
তিন ধারে তিন রসে মিশে বারাম দিতেছে ।।
মানুষ তিন রতি হয়ে, তিন রসেতে সোয়ার দিয়ে,
ও সে সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা—তিন নাম ধরেছে ।।
গরল রসে সাধারণী, সমঞ্জসায় শাস্ত্র শুনি,
সমর্থা অমৃত রূপে বিরাজ করতেছে।
যে জন রসিক হয়েছে, রসের ভিয়ান সে-ই জেনেছে।
ও যে গুরুর কৃপায় ঘাটে নেমে তিন রতি উজান করেছে ।।
রস-রতি উজান হ'লে গোপীকৃপা তাইরে বলে,
(ও যে) সহজ রূপে নয়ন দিয়ে জেন্তে মরেছে,
ঘাটে বসে রয়েছে, অনায়াসে মানুষ ধরেছে।
ও সাঁই হীরুচাঁদ কয়, ভাব না জেনে পাঞ্জ ঘুরে মলি মিছে ।।[২]

বস্তুতঃ 'ভাব' বা অন্তর্নিহিত অর্থটি না জানিলে বাউল-গানের আস্বাদ পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। যেমন একই মন তিনটি মনে, একই প্রেম (বা রতি) তিন রতি-রসে রূপান্তর লাভ করিয়াছে, তেমনি আবার একই স্রোত-ধারা (বা বেণী) প্রেম-সমুদ্রে তিনটি ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। এই ত্রিবেণী যে বস্তুতঃ একই ধারা হইতে আসিয়াছে এবং আবার একই ধারায় মিলিত হয়, তাহা জানিতে পারিলেই মানব-মনের ত্রিবেণী-সঙ্গম।

বাউল-গানে 'বর্জখ্‌' শব্দটি বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ। কোরানে ইহা তিনটি রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। বাউল-কবিগণ ইহাকে মুর্শিদের সহিত সমার্থক করিয়াছেন। মুর্শিদ বা গুরুরও তিনটি রূপ—শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু ও মন-গুরু। মনের এই

২। ঐ, নং ২৪৭।

ঊর্দ্ধগতি চতুর্থ পর্যায় বা লোকে উঠিলেই হয় 'চন্দ্র-ভেদ', অর্থাৎ সেই 'তূরীয়' অবস্থা যাহা মনের আর অনুধাবন করার ক্ষমতা নাই।

এই চারিটি 'লোক' বা 'আলমের কথাও বাউল-গানে বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। বাউল-কবি এরফান শাহ বলিতেছেন,

ও কেউ দেখবি যদি সহজ মানুষ, রূপের ঘরে যাও।
আছে নাছুত, মলকুত, জবরুত, লাহুত—চার মোকামে যাও ॥
সহজ মানুষের ধারা,
ধারা ধরতে হবে জেন্তে-মরা, পাগল-পারা,
তায় ধরতে গেলে স'রে পড়ে নয়ন মুদে রও ॥
মানুষের বারাম দ্বিদলে,
আকর্ষণে হেলেদুলে নিঃশব্দে চলে,
আছে চতুর্দ্দলে লীলাখেলা, গুরুমুখে লও॥
ওরে এরফান আলি,
হেলায় হেলায় দিন বয়ে যায়,
মন, তোরে বলি,
এবার সহজ মানুষ দীপ্ত করে সিদ্ধ হ'য়ে যাও ॥ [১]

আবার, পাঞ্জশাহ বলিয়াছেন,

ছিয়া ছফেদ লাল জহরে নূরের আসন ঘিরে রয়।
মোকাম নাছুত, লাহুত, মালকুত, জবরুত চারি হয়,
চার মোকামে মঞ্জিল-দ্বারে গুপ্ত বেশে কিরণ দেয়,
লা-মোকামে নূরের আসন, হাউতে নবোত বাজায় ॥ [২]

যেমন আছে বেদান্তে 'সপ্তলোক' বা যোগশাস্ত্রে 'ষট্‌চক্র,' তেমনি সুফী-ধর্মে তথা বাউলদের গানে পাই নাসূৎ, মলকূৎ, জবরূৎ, লাহূৎ ও হাউৎ প্রভৃতি 'হফ্‌ৎ 'আলম্' (সপ্ত পৃথিবী)। আত্মা হইতে মনের প্রভাব দুরীভূত হইলেই মানুষ আত্মারাম হইয়া আত্মার লীলাখেলা হৃদয়ঙ্গম করে এবং হাউতের নহবৎ বা বাদ্য সদা সর্বদা শুনিতে পায়।

১। ঐ, নং ৩০৩।
২। ঐ, নং ২৫৪।

আবার, যাহা 'মণিপুরচক্র' তাহাই মনের 'মণিকোঠার ঘর' বা 'স্ব-লোক'। তাহার উপরে বিরাজ করিতেছে অনাহত চক্র, মহর্লোক বা তূরীয়-মার্গ—যাহাকে সুফী বা আউলিয়াদের কথায় বলা যায় 'কূহে-কাফ্'। বাউল-শ্রেষ্ঠ লালন সেই কূহে-কাফের উদ্দেশ করিয়া আমাদের বলিতেছেন,

যে পথে সাঁই চলে ফিরে ও তার খবর করে কে।
যে পথে আছে য়দায়, ভীষণ কাল নাগিনীর ভয়,
যদি কেহ আজগুবি যায়, অমনি উঠে ছোঁ মারে।
পলক ভরে বিষ ধেয়ে উঠে, ব্রহ্মা অন্তরে।
সেই যে অধর ধরা, ধরতে চায় যারা,
চৈতন্য গুণী যারা, গুণ শিখি তাদের কাছে।
সামান্যে কি পারবি যেতে, সেই 'কু কাফের' ভিতরে।
ভয় পেয়ে জন্মাবধি, সে পথে না যাও যদি,
হবে না সাধন সিদ্ধি তা শুনে মন ঝুরে।
ও লালন বলে, যা করহে থাকতে হবে পথ ধরে।[১]

এই 'কু-কাফের' উল্লেখ করিয়া সুফীশ্রেষ্ঠ রূমী তাঁহার 'দীব্‌ানে-শম্‌সে-তব্রীজ.'-নামক কাব্য-গ্রন্থে বলিয়াছেন,

ব'অদা শুদন্ বর্ সরে-কূহে-ক্বাফ্;
দরান্ জায়ে জুজ., অন্‌ক্বা নব্‌দ্।

(অর্থাৎ, 'ক্বাফ্' পর্বতের শিখরে আরোহন করিয়া দেখি তথায় 'অন্‌ক্বা পাখী ছাড়া আর কেহ নাই।)

আবার, এই পাখী ও পর্বতের উল্লেখ করিয়া তাঁহার 'মস্‌নবী' কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে রূমী বলিয়াছেন, "(আত্ম-লোকে যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে) তুমি ক্রমে (জ্ঞান-) সূর্য বা (প্রেম-) সমুদ্রে পরিণত হইবে এবং ক্রমে (শুদ্ধদেহ-) পাহাড় বা (আত্মভোলা মন) 'অন্‌ক্বা পাখীর রূপ লাভ করিবে, কিন্তু তোমার প্রকৃত স্ব-রূপ ইহাও নহে, তাহাও নহে; হে (পরম), তুমি সকল চিন্তা-ভাবনা ও সবকিছুর উর্দ্ধে।"

১। হারামণি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২), নং ৮৪।

গাহ খুর্শীদ্ ও গহী দরিয়া শুয়ি ;
গাহ কুহে-কাফ্ ও গহ 'অনকা শুয়ি।
তু নহ ঈন্ বাশী নহ আন্ দর্ ধাতে-খীশ ;
আয় ফজ.ূন্ অজ.্, ব্ হম্হা ব্জ., বীশ্ বীশ্।

এই 'অ-ধর' মানুষটিকে পাইবার আশায়, বরং এই ধরার মানুষটিই যে বস্তুতঃ 'অধর' তাহা জানিবার জন্য বাউলগণ চলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের সেই 'একলা চল রে'-র পথে, তাঁহাদের একতারা বাজাইয়া। চলার পথে তাঁহাদের সম্বল কেবল গান। গুরুকে সঙ্গে করিয়া ও গুরু বা বর্জখের প্রশংসা তাঁহাদের চলার পথের 'প্রসঙ্গ' করিয়া তাঁহারা সেই চরম লক্ষ্যর দিকে কেবল অগ্রসর হইয়াই চলিয়াছেন। আরবী 'বর্জখ্' একদিকে যেমন সংস্কৃত 'কীলক'-এর সমার্থক, তেমনি আবার ফারসী 'ফর্সখ্' বা 'ফর্সন্‌গ্,' ইংরেজী parasang (গ্রীক parasagges) বা সংস্কৃত 'প্রসঙ্গ'-র সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে হয়। এই চলার পথে mile-post যেমন লক্ষ্যের দিশা জানাইয়া দেয়, তেমনি (গুরু-) সঙ্গ (বা ফারসী সন্‌গ্) সর্ব সঙ্গ বা ধরা-ছোঁয়ার অতীত সেই অ-ধর মানুষটিকে জানিবার সহায়ক মাত্র। তাই সার্থক তাঁহাদের জীবন ও তাঁহাদের চলার ভঙ্গি। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে বিদ্রূপ করিয়া, কি সুন্দরভাবে সেই 'একের' সাধনার কথা নিম্নলিখিত গানটিতে ব্যক্ত হইয়াছে !

তারের খবর জান না রে মন,
কোন তারেতে আছেন গুরু—
কল্পতরু সাধনের ধন।
বায়ু পিত্ত কফ্ জ্বরে
কবিরাজ ঔষধ করে,
তারের খবর না জানিলে সেই রোগী মরে।
চিন্তামণি ঔষধ করে,
ভব পাড়ের ল্যাটা সড়ে,
যাবে তোর রোগের বৃদ্ধি—
সাধন সিদ্ধি
গুরুর চরণ কল্পতরু সাধনের ধন।

ইংরেজেরা এক তার এনেছে,
তারের খবর তারে আসে,
এই তারের লনা কি,
সেই তারের কাছে।
মন ধরবি যদি তারে,
খুঁজে দেখ মন তারে তারে,
সিদ্ধ হবে গুরুর চরণ।[১]

এই বাউলদের সঠিক পরিচয় ও তাঁহাদের তত্ত্বকথার মর্ম-বাণী এই অল্প পরিসরের মধ্যে দেওয়া অতি কঠিন ব্যাপার। তাহা কেবল সেই 'তত্ত্বে' অভিসিক্ত কোন 'নবীন বাউল'-এর পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। তাই স্বনামধন্য একজন নবীন বাউলের কথায় তাঁহাদের পরিচয় দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি :

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে
পূজা-ব্যবসায়ী-ওদের ঠেকিয়ে রাখে
ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভক্তির আলোকে,
নক্ষত্রখচিত আকাশে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
গহন বেদনায়।
যে-দেখা বানিয়ে-দেখা বাঁধা ছাঁচে,
প্রাচীর ঘিরে, দুয়ার তুলে,
সে দেখার উপায় নেই ওদের হাতে।
কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোন দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙ্গে ফেলতে।
দেখেছি একতারা-হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে

১। ঐ, নং ১৯৫।

মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে ।

কবি আমি ওদের দলে,--
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।
পূজারি হাসিমুখে মন্দির থেকে বাহির হয়ে আসে,
আমাকে শুধায়, "দেখে এলে তোমার দেবতাকে ?"
আমি বলি, "না" ।
অবাক হয়ে শুনে, বলে, "জানা নেই পথ ?"
আমি বলি, "না" ।
প্রশ্ন করে, "কোন জাত নেই বুঝি তোমার ?"
আমি বলি, "না" ।...

ওরা তুলে নিয়ে গেল ওদের দেবতার পূজার
শাস্ত্র মিলিয়ে বাছা-বাছা ফুল,
রেখে দিয়ে গেল আমার দেবতার জন্যে
সকল দেশের সকল ফুল,
এক সূর্যের আলোকে চিরস্বীকৃত ।
দলের উপেক্ষিত আমি,
মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি,
যে মানুষের অতিথিশালায়
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই ।
লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের যুগে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে ।
তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার সগোত্র,
তাদের নিত্যশুচিতায় আমি শুচি ।
তারা সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক,
অমৃতের অধিকারী ।

মানুষকে গণ্ডির মধ্যে হারিয়েছি,
মিলেছে তার দেখা
দেশ বিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে।
তাকে বলেছি হাতজোড় ক'রে,—
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো
ভেদচিহ্নের-তিলক-পরা
সঙ্কীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।[১]

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পত্রপুট, নং ১৫।